আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের সমাজ চিত্র বলতে উনিশ শতকের মধ্যভাগের কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত ও নবশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের জীবনযাত্রা, তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক রীতিনীতি, নৈতিক অবক্ষয় এবং গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্বকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মতিলালের মতো 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পতন ও ঠকচাচার মতো চরিত্রগুলির উত্থান দেখানো হয়েছে, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

উপন্যাসের সমাজ চিত্রের মূল দিকগুলো:

- **কলকাতার নব্য বাবু শ্রেণীর জীবন:** ধনী ও উচ্ছৃঙ্খল মতিলালের জীবনযাপন, জুয়া খেলা, মদ্যপান এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের মাধ্যমে বাবু সংস্কৃতির অধঃপতন দেখানো হয়েছে।
- **ইয়ংবেঙ্গলদের প্রভাব:** ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ংবেঙ্গলদের প্রভাবে নব্য শিক্ষিত যুবকদের নৈতিক স্খলন ও তাদের জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- **গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব:** গ্রামীণ রক্ষণশীল সমাজ এবং শহুরে আধুনিকতার মধ্যে সংঘাত ও তার প্রভাব দেখানো হয়েছে, যেখানে ঠকচাচা গ্রাম থেকে শহরে এসে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করে।
- **নৈতিকতার পতন:** মতিলালের মতো চরিত্রগুলির মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখানে ঠকচাচা চরিত্রটি নৈতিকতার প্রতীক হিসেবে হাজির হলেও তার নিজস্ব দুর্নীতি ছিল।
- **সামাজিক রীতিনীতি:** সে সময়ের পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক প্রথা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিত্রও এতে প্রতিফলিত হয়েছে।
- **ভাষার ব্যবহার:** সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভাবিত রচনারীতির বাইরে প্রথম চলিত বাংলায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের বাস্তব ভাষা ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।
- **সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত:** উপন্যাসের শেষে মতিলালের পতন এবং ঠকচাচা চরিত্রটির মাধ্যমে এক ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বলতা ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত থাকলেও, মূলত সমাজের বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের নিপুণ অঙ্কনই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোটকথা, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' তৎকালীন কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তার ফলে সৃষ্ট নানা সামাজিক সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাংলা সাহিত্যের যতগুলো ক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে হালে সবচেয়ে প্রচলিত ও লোকপ্রিয় ক্ষেত্র হচ্ছে নভেল বা উপন্যাস। নভেল পড়েনি বা দেখেনি শিক্ষিত মহলে এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। কিন্তু দেড়শো বছর আগের কথা একটু ভাবুন তো। সে যুগে মানুষ পয়ারে (চরণান্তে স্বরের মিলযুক্ত ছন্দ) অভ্যস্ত ছিল। নভেল কী বা সেটার ধাঁচই বা কেমন- ইংরেজি জানা দুয়েকজন ছাড়া কেউ সবিশেষ ধরতে পারতো না। প্রথম যে ব্যক্তিটি বাংলার মানুষকে নভেল বা উপন্যাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, তিনি আর কেউ নন– প্যারিচাঁদ মিত্র। যার সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল

‘টেকচাঁদ ঠাকুর’। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্যারিচাঁদ মিত্রই প্রথম বাংলা ভাষায় নভেল লিখে দেখান। উপন্যাসটির নামও চমৎকার, ‘আলালের ঘরের দুলাল’।
তিনি চল্লিশ বছর বয়সে ‘মাসিক’ পত্রিকায় কয়েক সংখ্যায় উপন্যাসটি লেখেন। ১৮৫৪-তে ‘মাসিক’-এ ছাপা হয়। বলে রাখা ভালো, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সে সময়কার প্রসিদ্ধ গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার। রাধানাথ শিকদার ও প্যারিচাঁদ মিত্র ছিলেন বাল্যবন্ধু। পত্রিকায় প্রকাশের বছর চারেক বাদে এটি বই আকারে ছাপা হয়। পুরো কলকাতা জুড়ে হৈচৈ পড়ে যায়। প্যারিচাঁদ মিত্র এই নতুন সাহিত্যটিকে পরিচিত করান ‘উপন্যাস’ নামে। তখনো এ ধরনের বড় গল্পের যুতসই বঙ্গানুবাদ না থাকায় একে ‘নভেল’ বলার চল ছিল। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ সে সময় সাহিত্যিক মহলে আরেকটি কারণে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কারণটি ছিল, গুরুগম্ভীর সাধুর বদলে সমাজের সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত চলিত ভাষার প্রয়োগ। হালকা চালে এর ভাষার বিন্যাস করা হয়েছে। শব্দযোজনা দেখলেই বোঝা যায়, এটি করা হয়েছে স্বপ্রণোদিতভাবে, সমাজের সর্বস্তরের পাঠকের সুখপাঠ্য করে। প্যারিচাঁদের এই ভাষা প্রসিদ্ধ হয়েছিল ‘আলালী ভাষা’ নামে।
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে শুধু ধর্মীয় বা রোমান্টিক আখ্যান-উপাখ্যান। তৎকালে কবিগণ ধর্মের আশ্রয়ে তাদের রচিত সাহিত্য প্রসিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের এ সাহিত্যটিতে প্যারিচাঁদ নিয়ে এলেন সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, প্রথা, সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির জিগির। সদ্য পরাধীন একটি দেশ। সে দেশের সংস্কৃতি, রীতি-নীতিতে অবাধে হচ্ছে দখলদারদের সংস্কৃতির মিশেল। কোর্ট-কাছারি, আইন-কানুন ঢেলে সাজানো হচ্ছে। বাঙালি এগুলোকে আশ্রয় করে নতুন নতুন পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরছে, পাম্প শু ছেড়ে বুট ধরছে। ঠিক এরকম একটি সময়কে প্যারিচাঁদ বেছে নিয়েছিলেন। ইংরেজদের প্রশ্রয়ে জমিদার-তহসিলদার-জোতদার শ্রেণির উত্থান হচ্ছে। আর কিছু শ্রেণি গড়ে ওঠে ইংরেজদের আদালতকে ঘিরে। মহুরি, পেশকার, উকিলের সহকারী প্রভৃতি কয়েকটি পেশা। এমনই একজন ছিলেন বাবুরাম বাবু। তার বিপুল বৈষয়িকতার মধ্যে তিনি ভুলে যান তার একমাত্র পুত্রকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে। পিতার এমন আদর ও ঔদাসীন্যে পুত্র মতিলাল বখে যায়। মতিলালই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে। মতিলালকে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়ে বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তাতেও মতি ফেরে না মতিলালের। বাবার মৃত্যুর পর পুরো বিষয়-আশয় করায়ত্ত করে মতিলালের ভোগবিলাসতা ও অসৎকর্মের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। চারদিকে অসৎ ও কুসঙ্গ নিয়ে মতিলাল পরিবেষ্টিত থাকে সর্বদা। তার মা-বোন তাকে ত্যাগ করে। একপর্যায়ে মতিলালের কাশী গিয়ে মতি ফেরে। সেখানে মা ও বোনের সাথে মিলন হয়।
সামাজিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে মূলত লেখক এটি রচনা করেছিলেন। তৎকালীন কলকাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপারে জানা যায় এর মাধ্যমে। দেশে ফারসির চল ও ইংরেজির প্রতি নব আগ্রহ দেখিয়ে লেখক অপ্রত্যক্ষভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাংলার প্রতি উদাসীনতাকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের কদর ও চাকরিতে অগ্রাধিকারের বিষয়ে যেন লেখকের ছিল কিঞ্চিৎ ক্ষোভ। আর দুর্নীতির বিষয়াদি তো উপন্যাসের একটি বড় আকর্ষণ। টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা মামলা সত্যে পরিণতকরণ দিয়ে যেন চিরপরিচিত সামাজিক সমস্যাগুলোই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন লেখক।
উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলেই সেসময়কার মানুষের স্বরূপের সন্ধান মেলে সহজেই। বাবুরাম বাবু, যিনি ছিলেন মতিলালের বাবা, দিবস-রজনী শুধু অর্থের পেছনেই ছুটেছেন। সন্তানকে অতি আদর ও বৈভবে রেখে নীতিহীন করেছেন। বাংলাদেশে এমন উঠতি ধনীরা খুব

অপরিচিত নন। বাবুরাম বাবুর পুত্র মতিলাল। মাদকাসক্ত, চরিত্রহীন ও নীতিহীন এক কিশোর। ‘অতি আদরে বাঁদর’ প্রবাদের যথাযথ প্রয়োগের দেখা মেলে তার মধ্যে। মতিলালের মা ও বোনেরা সে যুগের অন্তঃপুরবাসিনীদের প্রতিনিধিত্ব করে। বোনদ্বয়ের সংলাপে স্পষ্টভাবে সে কথা বোঝা যায়।
বাবুরাম বাবুর শুভানুধ্যায়ী বেণীবাবু ও বেচারাম। যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় মতিলালের শিক্ষার। শেষে তারা ব্যর্থ হয়। বাবুরামকে বেণীবাবু পুত্রের শাসনের ব্যাপারে উপদেশ দেয়। তবুও বাবুরাম বাবুকে নির্বিকার দেখায়। আর আছে বাবুরাম বাবুর চারপাশের মোসাহেবের দল। এরা হাঁ তে হাঁ, না তে না মেলায় সর্বাবস্থায়। ধনীদের চৌকাঠের তলায় পরজীবী হয়ে বাঁচাই এদের ধর্ম। উপন্যাসের অপূর্ব চরিত্রটি হচ্ছে ঠকচাচা। যার পরামর্শে ও সাহায্যে বাবুরাম বাবু মিথ্যা মামলা জিতে ফেরেন। ঠকচাচার সাহায্যে লেখক তুলে ধরেছেন উপনিবেশিক যুগের প্রারম্ভিক সেই জোচ্চোর শ্রেণিকে, যারা দুর্নীতিকে গ্রহণ করেছিল পেশা হিসেবে।
‘আলালের ঘরের দুলাল’ কোনো জটিল কাল বা মন বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস নয়। সরাসরি সুনীতি ও কুনীতির স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে এখানে। লেখক নিজেও মাঝে মাঝে উপদেশ প্রদান করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, পঁচিশ বছর পর্যন্ত ছেলেদের বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ শাসনে রাখা উচিত। এমন করলে সারাজীবনেও সে সন্তান নীতিবিমুখ হতে পারবে না। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছেন। গুরুর প্রতি তার শিষ্যকে শাসন করতে বলেছেন কঠোরভাবে, যাতে শিষ্যের পরবর্তী জীবন উজ্জ্বলতর হয়। পুরো উপন্যাসেই এমন অসংখ্য উপদেশ লেখক প্রবেশ করিয়েছেন নির্দ্বিধায়।
‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ৩০ টি অধ্যায়ে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শীর্ষে মূল ঘটনাগুলো কয়েকটি টীকা আকারে বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায় এমন করে বলা হয়েছে–
১
বাবুরাম বাবুর পরিচয়, মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষা।
এভাবে ঘটনাগুলোকে তিরিশটি ভাগে ভাগ করে লেখা হয়েছে। দেখে মনে হবে, ছোট ছোট তিরিশটি গল্প।
উপন্যাসটিকে হীরারাল মিত্র নাটকে পরিণত করে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেছিলেন ১৮৭৫ সালে। উপন্যাসটিকে ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছে। এর ইংরেজি সংস্করণের নাম ‘দ্য স্পয়েন্ড চাইল্ড’।
‘আলালের ঘরের দুলাল’-কে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হলেও প্রথম সার্থক উপন্যাসের তকমাটি লেগেছে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘দুর্গেশনন্দিনী’-র গায়ে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে আলালী ভাষার অনুরাগী ছিলেন। উপরন্তু, তিনি প্যারিচাঁদ মিত্রকে প্রথম উপন্যাসিক এবং ‘আলালের ঘরের দুলাল’-কে প্রথম উপন্যাস বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তার ‘বেঙ্গল লিটারেচার’ শীর্ষক রচনায়।

বিভিন্ন কারণে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসরীতির ভিক্টোরীয় উপন্যাসরীতিকরণের আগে রচিত। ফলে বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব রীতির দারুণ একটা সম্ভাবনা এর ভেতর ছিল।

দ্বিতীয় কারণ, সে সময়ের সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুরীতির বাইরের একটি মিশ্র ভাষারীতি, যা চলিত ভাষারীতির সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। সে সময়ের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা একটি জীবন্ত চিত্র এ উপন্যাস। বিশেষত শিক্ষার চিত্র। শিশুর পেরেন্টিং কেমন হওয়া উচিত– সে প্রশ্নটিও উত্থাপন করে গেছেন প্যারীচাঁদ এ উপন্যাসে। শিশু শাসনের এ প্রশ্নটির মীমাংসা এখনও হয়নি। বিতর্কটি জারি আছে। উপন্যাসটির এটি একটি বড় প্রাসঙ্গিকতা। পাঠের সময় উপন্যাসটি এখনও নানামুখী চিন্তার পরিসর তৈরি করে। তৎকালীন সমাজের নিরিখে উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু হলো শিক্ষা। শিশুর শিক্ষা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু এই শিশুর মালিক কে? এই প্রশ্ন আজকের নয়, আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, শিশুর মালিক শিশু নিজেই। গাছ, ফুল যেমন বেড়ে নিজেই বেড়ে ওঠে; শিশু নিজেই তেমনি বেড়ে উঠবে। রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্পার্টায় একসময় শিশুদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হতো। স্পার্টা সাম্রাজ্য টেকেনি, কিন্তু রোমানরা টিকেছিল। কারণ তারা শিক্ষায় জ্ঞান ও দক্ষতার সম্মিলন ঘটিয়েছিল। তারা সামরিক ও মানবিক শিক্ষার সমন্বয় করেছিল। ফলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই উপন্যাসটিতে শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে তুলনামূলক দুটি চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভাষাও গুরুত্ব পেয়েছে নতুন আঙ্গিকে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সুনিপুণভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজচিত্রের বাস্তব রূপরেখা চিত্রিত করার চেষ্টা লক্ষণীয় এই উপন্যাসে। তুলনামূলক বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে নতুন ব্যঞ্জনায়। কথ্যভাষা, অর্থাৎ কলকাতার সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষার মিশ্ররূপ ছিল এটি। নানা রীতির ভাষার মিশ্রণ দূষণীয় বিবেচিত হওয়া প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর প্রথম দুটি বইতে মৌখিক ভাষার কাছাকাছি এই মিশ্রিত ভাষারীতিই মূলত প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাতেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি সাধুভাষাই অবলম্বন করেছিলেন মূল লেখ্য ভাষা হিসেবে। আলালের ঘরের দুলালে যার সূচনা হয়েছিল, সে ভাষার ঐতিহাসিক মূল্য চিরকালীন। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ডিরোজিওর শিষ্য। ডিরোজিওর আরেক শিষ্য ছিলেন রাধানাথ শিকদার। তিনি এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয় করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রাধানাথ শিকদার তাঁর বন্ধুদের উৎসাহিত করলেন এমনসব লেখাসমৃদ্ধ একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে, যার ভাষা ‘স্ত্রীলোকগণ বুঝিতে পারিবে’। এর আগে বাংলায় যত পত্রিকা ছিল, সংস্কৃত ভাষা না জানলে সেগুলো বোঝার সাধ্য কারও ছিল না। প্যারীচাঁদ দায়িত্ব নিলেন। পত্রিকা বের হলো। লেখকের সংখ্যা তখন দেশে নিতান্তই কম। অপণ্ডিত পাঠকের জন্য সহজ বাংলায় লিখতে পারেন, এমন লেখকের সংখ্যা আরও কম। তাই বাধ্য হয়ে সম্পাদককে একাই বিভিন্ন নামে নানা বিষয়ে লিখতে হতো। সে কারণেই ‘আলালের ঘরের দুলাল’ লেখার জন্য তাঁকে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের অনেক রচনায় নৈতিক ভাবের যে প্রাবল্য দেখা যায়, তা এতে নেই। চরিত্রচিত্রণে প্যারীচাঁদ যে একদেশদর্শী ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাচার। নিজের কৃতকর্মের অসততা সম্পর্কে ঠকচাচা সচেতন, কিন্তু নিজের কাছে এবং অন্যের কাছেও তার সপক্ষে তুলে ধরার মতো যুক্তি ছিল। ক্ষণিকের জন্য দেখা দিলেও ঠকচাচিও আমাদের মনে দাগ কেটে যান। অন্যদিকে রামলাল ও বরদা বাবুর সুশিক্ষা ও সকৃতি সত্ত্বেও তারা যতটা আদর্শের প্রতীক, ততটা জীবন্ত মানুষ নন। তবে প্যারীচাঁদের বর্ণনার স্বাভাবিক সরসতা সমগ্র রচনাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজও বইটির আবেদন শেষ হয়নি।

টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনাম ব্যবহার করে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের কেন্দ্রে আছে উনিশ শতকের বাঙালি বাবু , ভদ্রলোক ও তাদের আত্মীয় , বন্ধু এবং সাকরেদরা। বাবু ও ভদ্রলোকদের সম্পর্কে একটি জরুরী ব্যবধান অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এই প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে বলেছেন। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' বইয়ের আলোক সম্পাতী আলোচনায় তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে গ্রামীণ সমাজ জীবনের

পুরনো বৃত্তটি ছেড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে নব্য জমিদার ও মুৎসুদ্দী শ্রেণির যে অংশটি নিজেদের কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছিল ও নানা বেলেল্লাপণায় জড়িয়ে পড়েছিল তারাই বাবু। কিন্তু এই বাবু সমাজের যে আত্মসচেতন ও নিরীক্ষাশীল অংশটি নিজেদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে উন্নত করতে চাইল , তারাই হয়ে উঠতে পারল ভদ্রলোক।

বাবু সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এই উপন্যা সে আছেন বাবুরামবাবু ও আলালের ঘরের বড় দুলাল মতিলাল। অন্যদিকে বাবু থেকে ভদ্রলোক হয়ে ওঠে সেই পরিবারেরই ছোট ছেলে রামলাল। একই পরিবারের সহোদরদের মধ্যেকার এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে বাবু ও ভদ্রলোকের পার্থক্যটি মৌলিক এবং তা মূলত আত্মজিজ্ঞাসা ও নীতি, সংস্কৃতিবোধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কলকাতা ও তার নিকট শহরতলী – বালি, ভদ্রেশ্বরের মধ্যেই এই উপন্যাস মূলত ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু মতিলালের সার্বিক বিপর্যয়ের সূত্র ধরে তার জমিদারি যশোরের গ্রামেও গিয়ে পৌঁছেছে আখ্যান। কলকাতার বাবু সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে যেখানে মূলত ব্যঙ্গনির্ভর বাহ্য জীবনের কথাই বলছিলেন প্যারীচাঁদ, যশোরের জমিদারী ও গ্রাম জীবনের প্রসঙ্গে গিয়ে তিনি কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থা , নীলচাষ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অনেক অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আধুনিক বাংলা সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করেছে – এই বঙ্কিমী মতটি অনেকটাই সর্বজনগ্রাহ্য। এখানে সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঠিক আগের ভূমি রাজস্বগত পরীক্ষা নিরীক্ষা, দশ সালা বন্দোবস্তের কথা ব্যাপকভাবেই এসেছে। জমিদারী শাসন শোষণ এবং মহাজনী প্রথার জোড়া ফলা রায়তকে কীভাবে বিদ্ধ করে তার ব্যাপক ছবি না থাকলেও এই সংক্রান্ত আশঙ্কাবাণীগুলি বিবৃত হয়েছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও সাহেব সাহেব আঁতাতে কোম্পানী শাসনের বিচার ব্যবস্থার একদেশদর্শী চেহারাটিও প্রত্যক্ষ করেন পাঠক। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে বাসা বাঁধা দুর্নীতির ছবিও অন্য প্রসঙ্গে দেখা গেছে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতা শহরটি কেমন ছিল , বিশেষ করে তার বাবু সমাজের চেহারা চরিত্র কেমন ছিল তা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নববাবুবিলাসের মতো বইতে দু দশক আগেই বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের সমকালে হুতোম তার নকশাতেও সে ছবি এঁকেছেন। আলালের ঘরের দুলাল কিন্তু নকশা জাতীয় রচনাতে সীমাবদ্ধ না থেকে উপন্যা সের দিকে এগোতে চেয়েছে সচেতনভাবে। গ্রন্থের শুরুতে গ্রন্থকার সচেতনভাবেই নভেল রচনার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছেন, এই সুনির্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করেই।

এটা ঠিকই আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস হিসেবে সম্ভাবনাময় এবং বাংলায় সচেতনভাবে সম্ভবত প্রথম এই জাতীয় লেখার প্রচেষ্টা । এই হিসেবে গ্রন্থটি ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। পাশাপাশি এটাও মনে হয় নভেলের শিল্পসার্থকতার দিক থেকে এটি সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতা। উপন্যাসের একদিকে রয়েছে খল চরিত্রগুলি – মতিলাল ও ঠকচাচা যার অন্যতম। অন্যদিকে রয়েছে বরদাবাবু ও রামলালের মতো আদর্শ চরিত্র। কিন্তু খল বা আদর্শ – উভয় ধরনের চরিত্রই অত্যন্ত টাইপ ধরনের নির্মাণ। তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব বা ঘাত প্রতিঘাত সেভাবে নেই। মতিলালের বদল ও অনুশোচনাকে উপন্যাস নায়কের নীতিগত রূপান্তর বলেই আমাদের মনে হয়। তাতে কেবল আকস্মিকতাই আছে কিন্তু চরিত্রের ভেতরের কোনও দ্বন্দ্বর উপস্থিতি নেই। ঠকচাচা তার অন্তিম সাজার পর দ্বীপান্তরকালে যে হাহাকার

করেন তার মধ্যে গোটা জীবনের জন্য আক্ষেপোক্তি আছে , কিন্তু চরিত্রটির নিজস্ব দ্বন্দ্ব ও রূপান্তর দেখানোর কোনও সুযোগ কাহিনীতে আর ছিল না। ফলে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্তের আধুনিক সংস্করণ হিসেবেই এটি থেকে গেল।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের নারী চরিত্ররাও মূলত টাইপ চরিত্র। কিন্তু তাদের যন্ত্রণাটি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। তাঁরা অন্দরমহলে কোণঠাসা, পুরুষের মুখাপেক্ষী ও প্রায়শই অবহেলিত ও নিগৃহীত। জননী, জায়া, ভগিনী – সমস্ত পরিচয় নির্বিশেষেই তাঁদের যন্ত্রণাময় বাস্তবতাটি উঠে এসেছে। বাবুরামবাবু প্রথম স্ত্রী থাকতেও কেন বয়সকালে দ্বিতীয় বিবাহ করেন তার উত্তর তিনি নিজেও সমালোচক বন্ধুদের দিতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবাহের অল্প পরে ই তার মৃত্যু হয় ও দ্বিতীয়া স্ত্রী সারা জীবন সব দিক থেকে উপেক্ষিতা থেকে যান। প্রথম স্ত্রী স্বামীর থেকে মর্যাদা পান নি শুধু তাই না, যে পুত্রকে প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছিলেন সারা জীবন তার কাছ থেকেই চরম অসম্মান ও আঘাত পেয়ে মনের দুঃখে স্বামী পরিত্যক্তা কন্যাকে নিয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হন। আরেক কন্যা তার আগেই বৈধব্যের যন্ত্রণা ও রোগশোক নিয়ে আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিল। দ্বাদশ শতকের কৌলীন্যপ্রথার রেশ উনিশ শতকের মধ্যভাগেও কতটা ছিল – প্যারীচাঁদের এই উপন্যাস থেকে তা বোঝা যায়।

বাবু ও ভদ্রলোকদের যে জরুরী ব্যবধান এই উপন্যাস আলোচনায় বারবার জরুরী হয়ে ওঠে তার অন্যতম দিক নারীদের প্রতি এই দুই গোত্রের মানুষের পৃথক দৃষ্টিকোণ ও আচরণ। বাবুরামবাবু ও তার বড় ছেলে মতিলাল যেখানে মহিলাদের যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ কারণ সেখানে ছোট ছেলে রামলাল বা তাঁর প্রিয়জন বরদাবাবু মহিলাদের আগলে রাখেন যথাসম্ভব। সম্মান ও সেবায় তাঁদের ওপর সমাজ পরিবারের চাপানো ক্ষতে প্রলেপ দিতে চান। মৃত্যুর সময় তাই রামলালের দিদি ভাইয়ের হাতটি ধরে থাকেন আর বলে যান আগামী জন্মে এরকম ভাই তিনি পেতে চান। বরদাবাবুও আশ্রয়চ্যুত বাবুরামবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং মতিলালের স্ত্রীকে চূড়ান্ত বিপদে নিজের ঘ রে আশ্রয় দেন।

নারীদের প্রতি দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের স্পষ্ট দিকটি ছাড়াও বাবু ও ভদ্রলোকদের মধ্যেকার একটি পার্থক্য খানিকটা অলক্ষ্যেই যেন থেকে যায়। কেবল একটু তলিয়ে ভাবলে তবেই আমরা খেয়াল করি যে বাবু চরিত্রগুলি , বিশেষত মতিলাল যেখানে সব সময়েই সাকরেদ পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দ মোচ্ছবের মধ্যে রয়েছে , সেখানে ভদ্রলোকদের প্রতিভূ রামলাল বা বরদাবাবু অনেকটাই একক। আসলে ভদ্রলোকদের যে নিরীক্ষা ও আত্মানুসন্ধান বাবু শ্রেণির লোক হয়েও তাদের পৃথক করে তোলে , এ তারই খানিক প্রতিফলন। তারা চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সমাজসেবায় ব্রতী হতে পারে, দীন দুঃখীর সহায় হতে পারে, কিন্তু ইয়ার দোস্ত নিয়ে মোচ্ছবে মেতে থাকা তাদের স্বভাব নয়।

আলালের ঘরের দুলালের ভাষা নিয়ে এই রচনার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। আলালী ভাষাকে অনেকে ঈশ্বরচন্দ্র বা অক্ষ য় কুমার দত্তের তৎসমবহুল শব্দের বিপরীতে স্বাভাবিক বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এরকমও অনেকে মনে করেছেন যে হুতোমি ভাষা বা আলালী ভাষার উত্তরাধিকার না মেনে বিদ্যাসাগরীয় রীতিকেই আরো সমৃদ্ধ করার দিকে বঙ্কিম এগনোর ফলে এই ভাষা উচ্চশিক্ষিত উচ্চবর্ণের আধিপত্যকেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিল, জনসাধারণ ও

তার ভাষাকে শিষ্ট সাহিত্যের বাইরে নিয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের কালে তরজা সংস্কৃত ও আরবী ফারসীর দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলল ও এর মধ্যে ধর্মের অনুষঙ্গ ঢুকে পড়ল।

আলালী ভাষাকে একটা বিদ্রোহ হিসেবে দেখে কৃষ্ণকমল ভট্টা চার্য মন্তব্য করেছিলেন , "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয় ১৮৫৪/৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। ... বিদ্যাসাগর হাসিতেন। মাসিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার আলালের ঘরের দুলালে সেই tendency র চূড়ান্ত করিয়া যান।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায় – কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য – পৃ ৮৮ -৮৯)।

একই রকম কথা পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ' নামক বইতে। তিনি সেখানে লিখেছেন , "একদিকে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , অপরদিকে খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন নবজীবন লাভ করিল , তখন তাহা সংস্কৃত বহুল হইয়া দাঁড়াইল। ... অনেকে এরূপ ভাষায় প্রীতিলাভ করিলেন বটে , কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট , বিশেষত সংস্কৃত অনভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অস্বাভাবিক , কঠিন ও দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ... যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর সংস্কৃত বহুল বাঙ্গালার ভার দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল , তখন মাসিক পত্রিকা নামে এক ক্ষুদ্রকায়া পত্রি কা দেখা দিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোকপ্রচলিত সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। ... আলালের ঘরের দুলাল বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম 'আলালী ভাষা' হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে গাম্ভীর্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। এই আলালী ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা হুতমের নক্সা। ... এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গ সাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইটা দাঁড়াইল।" (পৃষ্ঠা – ১৪০ – ১৪১)

শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্যে র শেষাংশে একটা চমক আছে। সাধারণভাবে সংস্কৃত রীতির গদ্য নিয়ে যারা আপত্তি তুলেছেন তারা এবং সাধারণভাবে বাংলা গদ্য শৈলীর বিশ্লেষকরা বিদ্যাসাগরীয় ও বঙ্কিমী ভাষাকে এক বর্গে রাখেন ও বঙ্কিমী গদ্যকে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যেরই পরিশীলিত রূপ বলে বিবেচনা করেন। এই বর্গের চে য়ে আলালী ও হুতোমী ভাষাকে আলাদা বর্গের ভাষা বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী যে আলালী গদ্যেকে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের উল্টোদিকে দাঁড় করানোর পর সেই আলালী গদ্যের উত্তরাধিকার বঙ্কিমী গদ্যে খুঁজে পেলেন , তা খানিক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমাদের মনে হয় এখানে গদ্য শৈলির বিচারে শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো বিশিষ্ট মানুষের খানিক ভ্রান্তিই ঘটেছে।

বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতিটি কী এবং তাতে তৎসম ও আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের বিষয়টি কয়েক শতক ধরে কীরকম ছিল , তা মধ্যযুগের সাহিত্য বিশ্লেষণ করে আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু তা স্বতন্ত্র এক অনুসন্ধানের বিষয়। বর্তমান আলোচনায় কেবল এটুকুই বলা যায় যে আলালী ভাষা সকল সাধারণের বোধগম্য এবং এ কারণেই তা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের চেয়ে স্বাভাবিক - এই দাবি নানা কারণেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা নজর দিতে পারি এই বইয়ের সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণটির দিকে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণটিতে মূল উপন্যাসের শেষে দুটি বিশেষ অংশ যুক্ত করেছেন দুই সম্পাদক - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। প্রথম অংশটির শিরোনাম " দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।" মূল উপন্যাসটি যেখানে ১ থেকে ১৩৫ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা, যেখানে এই অংশটি ১৩৭ থেকে ১৫৭ অর্থাৎ ২১ পাতা জায়গা নিয়েছে। দ্বিতীয় অংশটির শিরোনাম "অবহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য ও শব্দ বিন্যাসের নিদর্শন"। এই অংশটি ১৫৮ পাতা থেকে ১৬৪ অর্থাৎ ৭ পাতা জায়গা নিয়েছে। সাহিত্য পরিষদের মতো বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত এক মান্য সংস্করণে বজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর মতো দুই প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সম্পাদককে ১৩৭ পাতার একটি উপন্যাসের পরিশিষ্টে যখন দুরূহ ও কম প্রচলিত শব্দর তালিকা তৈরির জন্য ২৮ পাতা ব্যয় করতে হয় , তখন সেই উপন্যাসের ভাষাকে জনসাধারণের ভাষা বলে চিহ্নিত করার সারবত্তা কতটা , সেই প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু শব্দকে যদি পরিশিষ্টে দেওয়া তালিকা থেকে আমরা এখানে হাজির করি তাহলেই বোঝা যাবে এই ভাষা কতটা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য।

আণ্ডিল (বহু ধনশালী), আতাই (বিনা বেতনে সখের বাদ্যকর), আন্‌খা (অনভ্যস্ত), আবতলক (এখনো পর্যন্ত), আমপক (পবিত্র), ফয়লা (আমলা সদৃশ কর্মচারী), আয়েব (দোষ), উটনোওয়ালা (ধারে রোজকার মালসরবরাহকারী দোকানদার), উটনো (ধারে বিক্রয়), একিদা (একাগ্রচিত্ত/ ঝোঁক), এততাহাম (সন্দেহ), ওক্ত (সময়), ওয়াজিব (ন্যায়সঙ্গত), ওলাব (ফেলে দেওয়া) – এরকম বহু শব্দ উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যার তালিকা করেছেন সম্পাদকদ্বয় ও তাদের অর্থও পাঠকের সুবিধার জন্য দিয়ে দিতে হয়েছে।

এমন নয় যে ঠকচাচার কথাবার্তাতেই কেবল আরবী ফারসী বহুল অপ্রচলিত শব্দ শোনা গেছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে নানাজনের সংলাপে ও আখ্যানের বর্ণনা অং শে অজানা, অল্পজানা শব্দ প্রচুর। ফলে আলালের ঘরের দুলালের ভাষাকে জনগণের মুখের স্বাভাবিক ভাষা হিসেবে দেখানোর যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবে সেকালের অনেক বিশিষ্ট পাঠক কেন আলালী ভাষাকে এরকম মুখের ভাষা বলে মনে করছিলেন ? এরকম হওয়া কী সম্ভব যে আজকের অচলিত বা অল্প প্রচলিত শব্দগুলি তখনকার দিনে ততটা অচলিত ছিল না ? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মানতে হবে দেড়শ বছর দূরে দাঁড়িয়ে সেকালের গদ্য সম্পর্কে বিচার নানাভাবে সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে।

স্বয়ং বঙ্কিমও আলালী গদ্য নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং সেই আলোচনায় আলালী গদ্যের শক্তি ও দুর্বলতার উভয় দিক বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিম লিখেছেন , “দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙালির বোধগম্য এবং সকল বাঙালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই সেই ভাষা গ্রন্থ প্রণয়ণে ব্যবহার করিলেন। ” তবে এখান থেকে যদি কারো মনে হয় যে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরীয় ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তা ঠিক হবে না। কারণ এর আগেই বঙ্কিম লিখেছেন , “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরকম সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাহার পরেও পারে নাই।” বঙ্কিম বলেন যে বিদ্যাসাগরের গদ্যে মুগ্ধ হয়ে সেই আদর্শেই এরপর কেবল বাংলা গদ্য লেখা হয়েছে। ফলে গদ্যরীতিতে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা গেছেপ্যারীচাঁদ এসে গদ্যের একটা নতুন আদল আনলেন। যা বিদ্যাসাগরের ভাষার চেয়ে মুখের ভাষার অনেক নিকটবর্তী হল। এবং ভাষার বৈচিত্র্য এল। কিন্তু আলালী গদ্যের সীমাব দ্ধতার দিকটিও বঙ্কিমের চোখ এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন , আমি এমন বলিতেছি না যে আলালের ঘরের দুলালের ভাষা

আদর্শভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নতভাব সকল , সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ।" (বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

হুতোমের ভাষা বা আলালী ভাষার নির্দিষ্ট আদলটি ব্যঙ্গ সৃষ্টির কাজে অনেকদূর সার্থক। হুতোম যেখানে নক্সা লিখেছেন সেখানে এই ভাষা যতটা কার্যকরী , প্যারীচাঁদ যেখানে নভেল রচনা প্রয়াসী সেখানে এই ভাষা ততটা কার্যকরী কীনা তা এই প্রসঙ্গে আলোচনাযোগ্য। আলালের ঘরের দুলালের আখ্যানকার রচিত মুখবন্ধ পড়লেই বোঝা যাবে তিনি সচেতনভাবেই নভেল লিখতে চেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র ও নানা বিদ্যায় পণ্ডিত প্যারীচাঁদ পশ্চিমী নভেলের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন , এই অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। উপন্যাস যে নকশা জাতীয় আখ্যান থেকে আলাদা সেকথাও নিশ্চিত প্যারীচাঁদ জানতেন। উপন্যাসের ব্যাপ্ত জীবনদর্শন , তার ডায়লজিক ও পলিফোনিক চরিত্রর জন্য যে ধরনের ভাষা জরুরী তা কেবল ব্যাঙ্গাত্মক হতে পারে না। নিহিলিস্টিক সার্বিক আক্রমণ নয়, জীবন ও আদর্শের নির্মাণ বা তার ভাঙনযন্ত্রণা উপন্যাসকল্পনার ভিত্তি। তার বাহন হবে যে ভাষা তার মধ্যে তাই বহুস্তরিকতাকে ধারণ ও বহন করার উপাদান থাকা চাই। হুতোমী বা আলালী ভাষার তা ততটা নেই। তাই নক্সা লিখিয়ে হিসেবে কালীপ্রসন্ন এই ভাষা নিয়ে সফল হলেও নভেল লিখিয়ে হিসেবে আলালী ভাষার নিরীক্ষক প্যারীচাঁদ সেভাবে সফল নন। চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে দুর্বলতার পাশাপাশি ভাষাগত বিষয়টিও আলালের উপন্যাস সিদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী বলে আমাদের মনে হয়।

উপন্যাসকল্পনার সিদ্ধির জন্য বাংলা উপন্যাসকে আরো এক দশক ও বঙ্কিমের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৮৫৫ তে আলালে র পত্রিকাপাঠ প্রকাশের দশ বছরের মাথায় ১৮৬৫ তে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব থেকেই বাংলা উপন্যাস শিল্পসার্থকতার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করে। অবশ্য 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের আগে উপন্যাসোচিত বাস্তবতাকে বঙ্কিমও খুঁজে পান নি , রোমান্সের পথেই তাঁকে হাঁটতে হচ্ছিল। তবে উপন্যাসের শিল্প সার্থকতার উপযুক্ত ভাষাটি রোমান্স পর্বের 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'তেই তাঁর আয়ত্তাধীন হয়েছিল। এই ভাষাগত সিদ্ধি যখন আধুনিক জীবনের জ্বলন্ত প্রশ্নগুলিকে নিয়ে 'বিষবৃক্ষ'র মতো রচনার জন্ম দিল তখনই বাংলা উপন্যাস তার প্রকৃত জয়যাত্রা শুরু করল।

ডিরোজিও ভাবধারাপুষ্ট ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অনুগামী প্যারীচাঁদ মিত্র (২২ জুলাই ১৮১৪-২৩ নভেম্বর ১৮৮৩) বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির সুপ্রচেষ্টা যদিও সার্থক উপন্যাস স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তার উনিশটি গ্রন্থের মধ্যে এগারোটি গ্রন্থ বাংলা শিল্প-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নকশা জাতীয় যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমধিক উপন্যাসের লক্ষণাবিষ্ট। জীবনের নানামুখী জটিলতা এখানে স্থান পেয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল রচনাটিতে নকশা জাতীয় গ্রন্থের কাহিনির ধারাবাহিকতা

রক্ষা করতে গিয়ে লেখক তৎকালীন কলকাতার একটি পরিবারের উত্থান-পতন, তাদের জীবনযাত্রা, বিদ্যাশিক্ষা, আচার-বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দিক তুলে ধরেছেন।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাহিনিতে ত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শীর্ষে একটি করে ব্যাখ্যাধর্মী নাম আছে। গ্রন্থটি তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় লিখিত। নব্য শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যকলাপ ও পরিণতি এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে গা ভাসিয়ে তরুণের বিপথে যাওয়া এবং পরবর্তীকালে ভুল বুঝতে পেরে সঠিক জীবন পরিচালনা এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থের একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি। বাবুরামবাবু, বাবুরামবাবুর স্ত্রী, মতিলাল, রামলাল, বরদাপ্রসাদবাবু, বেণীবাবু, বেচারাম, ঠকচাচা, ঠকচাচী , মোক্ষদা, প্রমদা প্রভৃতি।

বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এলাকার প্রভাবশালী এবং গণমান্য বাবুতে পরিণত হয়েছে। তার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা যথাক্রমে মতিলাল, রামলাল, মোক্ষদা, প্রমদা। মতিলাল অসৎসঙ্গে এবং ঠকচাচা প্রমুখ কুচক্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ধীরে ধীরে অধঃপতনের অলতে নিমজ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে বাবুরামবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল। বরদাপ্রসাদবাবুর সান্নিধ্যে, সুনির্দেশে প্রথম থেকেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছে। মতিলালের অধঃপতন এবং সেখান থেকে সৎসঙ্গে কিভাবে জীবনের উন্নয়ন ঘটায় সেটাই আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য বিষয়।

কন্যাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাবুরামবাবু প্রচুর অর্থব্যয় করে দুই কন্যারই বিয়ে দেন। কুলীন জামাতারা অনেক স্থানে দার পরিগ্রহ করায় বিশেষ পারিতোষিক না পেলে বৈদ্যবাটীর অভিমুখী হতো না। কন্যা মোক্ষদা বিধবা। এবং প্রমদার ভাগ্যে কুলীন স্বামীর স্বাক্ষাৎ ঘটে না। কুলীনরা হলো সম্ভ্রান্ত বংশজাত। তৎকালে বল্লাল সেন দ্বারা প্রবর্তিত হিন্দুকুল ও বর্ণ সমীকরণের এরূপ আইনের ফলে সমাজে কুলীন বংশজাতদের খুব মান্যগণ্য করা হতো। ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ উনবিংশ শতক পর্যন্ত বেশ কলঙ্কিত ছিল।

একজন কুলীন বংশজাত পুরুষ কুলীন বা অকুলীন যেকোনো ব্রাহ্মণ বংশেই বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ে হবে কেবল কীলুন বংশেই। ফলে কুলীন কন্যাদের জন্য সেসময় পাত্র পাওয়া দায় হয়ে যেত। পত্রদের ক্ষেত্রে তারা কুলীন হলেও অকুলীনজাত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতেন কিন্তু কন্যারা পারতেন না। ফলে সমাজে কুলীনদের বহুবিবাহ বাড়তে থাকে। কন্যার পিতা সামাজিকভাবে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য যেকোনো কুলীনের সঙ্গেই চড়া পণে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হতেন। কুলীন হওয়ার কারণে মৃত্যুশয্যায় থাকা পাত্রের সঙ্গেও কন্যার বিয়ে দিতে পিছপা হতেন না কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবার। সেকারণেই সমাজে অল্পবয়সে মোক্ষদারা বিধবা।

পিতার অর্থকড়ি দিয়ে কন্যা সন্তানের জন্য কুলীন পাত্র জোগাড় করলেও সুখের স্পর্শ সেসময়ের কন্যারা পেত না। কারণ কুলীনবংশ জাত এসব পুরুষের শত শত পত্নী থাকত। ২-৩ বছর ঘুরেও হয়তো এক স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটত না। এই বিবাহবণিকেরা নিজেরদের কুলীনত্বকে পুঁজি করে অল্পবয়সী কন্যাদের সতীত্ব গ্রাস করত সেইসঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অর্থকড়িও ভোগ করতো। যখন টাকার প্রয়োজন হতো তখনই শ্বশুরগৃহে তাদের প্রবেশ ঘটতো। ইতিহাস ঘাটলে এমনও পাওয়া যায় তাদের বিবাহের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, একটি বিবাহ সেরে স্ত্রীর নাম-ধাম, ঠিকানা

খাতায় লিখে অন্যত্র গমন করতেন। সমাজের এই কালো অন্ধকারে নারীদের জীবন। যেখানে নারী শুধু পণ্য সামগ্রী।

সমাজের বিধিনিষেধের নামে কন্যাদের সঙ্গে চলতো প্রহসন। মোক্ষদা বিধবা আর প্রমদা কুলীন স্বামীর আশায় দিন কাটাত। সমাজের এই কদর্য দিক উঠে এসেছ আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থটিতে। অনেক সময় বিবাহবণিকেরা রাতে শুতে গিয়ে স্ত্রীর সব গয়না নিয়ে চম্পট দিত। এই বিবাহবণিকদের সঙ্গে বিবাহিতা কুলীন নারী যৌনতৃষ্ণা মেটাতে অনেক সময় পরপুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হত। এর ফলে অবাঞ্চিত সন্তান আর ভ্রূণ হত্যা হতো। নারীকে সমাজ মানুষ রূপেই গণ্য করা হতো না। তাদের প্রতি এভাবেই সামাজিকভাবে নারীদের ওপর দিনের পর শোষণ চলেছে।

সমাজের পরিবর্তন হয় শ্লথগতিতে। তবু হয়। যুগে যুগে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা এসেছেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী সমাজের পক্ষে কথা বলেছেন। কৌলীন্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ সমাজ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু আজও সমাজে থেকে নারীর প্রতি অবিচার- অন্যায় মুছে যায়নি। অবিচারের ভোল পাল্টেছে কিন্তু থেকে গেছে তার মূল। তাই এর বিনাশ প্রয়োজন। সে শক্তি একমাত্র নারীর হাতেই রয়েছে।

এই গ্রন্থটিতে তিনি নারীদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তারা সবাই সমাজের শোষণের জালে বন্দি। বাবুরামবাবুর স্ত্রী সতীসাধ্বী স্ত্রী। স্বামীর অনুরক্ত হলেও স্বামী বাবুরামবাবু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছে। চরিত্রটি ম্লান। তার চরিত্রে নারীর জাগরণ দেখাননি লেখক। ছেলে মতিলাল স্ত্রীর প্রতি নিপীড়ন করলে তাকে অভয় দিয়ে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেয়। এদিক থেকে তার মধ্যে মানবিক চেতনা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ঠকচাচী স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। ধূর্ত ঠকচাচাকেও রীতিমতো বশে রাখার চেষ্টা করেছে যদিও গ্রন্থটিতে সরাসরি চরিত্রটির উপস্থিতি নেই। ফলে চরিত্রটির প্রতিবাদও যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

প্রমদা, মোক্ষদার জীবনের যতটুকু জানা যায় তাতে কৌলীন্য প্রথার চরমতম রূপ প্রকাশিত হয়েছে। নারীর জীবন যে অসহায়, অবহেলার শিকার প্রতিনিয়ত তা এই গ্রন্থের প্রতিটি নারীই বহন করেছে। মতিলালের বিমাতা এবং স্ত্রীর কোন ভূমিকা কাহিনিতে নেই। গ্রন্থটিতে প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই অবন্তর হয়ে উঠেছে শুধু তাদের উপস্থিতিকে সঠিকভাবে বুননের অভাবে। কাহিনির মধ্যে নারীদের যেভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে তাতে নারীর ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস পাঠককে চিরন্তন নারী সত্তাকে স্মরণ করায়।

নারী যুগ যুগ ধরে শোষণ-বঞ্চনার শিকার। কুলীন প্রথা-সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটলেও নারী শোষিত হচ্ছে নতুনরূপে। সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের ভাগ্য নারীকেই পরিবর্তন করতে হবে। আলালের ঘরের দুলালে প্যারীচাঁদ মিত্র বৈসাদৃশ্য কাহিনি, ক্রমপরিণতিহীন ঘটনাবিন্যাস, অবিকাশিত চরিত্র, ব্যক্তিত্বহীন নায়ক এবং অবাস্তব নারী চরিত্র এবং প্রণয় রসহীনতার কারণে সার্থক উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি। নীতিকথা প্রচারই যেন লেখকের কাছে মুখ্য ছিল। ফলে সার্থকতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে৷ তবু উপন্যাস সাহিত্যের জগতে লেখকের সূচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে অমরত্ব দান করেছে।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের ঠকচাচা চরিত্রটি একটি ধূর্ত, বৈষয়িক বুদ্ধিমান এবং জীবন্ত খলনায়ক, যে মোকাজান মিঞা নামেও পরিচিত; সে সমাজের নিম্নবর্গের একজন প্রতিনিধি হলেও তার চতুরতা ও মাতব্বরি দিয়ে উচ্চবিত্ত মতিলাল ও তার পরিবারকে চালিত করে এবং উপন্যাসের কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম দিকের বাস্তবধর্মী ও জটিল চরিত্রের উদাহরণ।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য:

- **ধূর্ত ও চতুর:** সে অত্যন্ত কৌশলী ও চালাক, যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে পটু।
- **বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন:** শুধুমাত্র টাকা-পয়সার হিসাব বোঝে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে।
- **খলনায়ক:** মতিলাল ও বাবুরামের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার পেছনে তার ইন্ধন ছিল, যা তাকে উপন্যাসের প্রধান খল চরিত্রগুলোর অন্যতম করে তুলেছে।
- **মাতব্বর ও সবজান্তা:** তার মধ্যে এক ধরনের মাতব্বরি ও সবকিছু জানার ভান দেখা যায়, যা তাকে আরও প্রভাবশালী করে তোলে।
- **জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী:** তৎকালীন সমাজের একজন নিম্নবিত্ত মানুষের বাস্তব প্রতিচ্ছবি সে, যা চরিত্রটিকে অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছে।

সংক্ষেপে, ঠকচাচা চরিত্রটি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা উপন্যাসের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছে এবং বাংলা সাহিত্যে জটিল চরিত্র চিত্রণের পথ খুলে দিয়েছে।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে মতিলাল হল **উচ্ছৃঙ্খল, পথভ্রষ্ট ও বিলাসী** চরিত্র, যে ধনী পরিবারের আদুরে সন্তান হিসেবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে এবং পরে ভুল পথে চালিত হয়, কিন্তু উপন্যাসের শেষে অনুশোচনা করে। সে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও তার সঙ্গী ঠকচাচা, হলধর, গদাধর চরিত্রগুলি উপন্যাসের সাফল্য এনে দিয়েছে এবং মতিলালের পথভ্রষ্ট জীবন সমাজের একটি দিক তুলে ধরেছে।

মতিলাল চরিত্রের মূল দিক:

- **উচ্ছৃঙ্খল জীবন:** সে ছিল উচ্চবিত্ত ঘরের আদুরে সন্তান, যার জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী।
- **পথভ্রষ্ট:** তার সঙ্গীরা (হলধর, গদাধর) ও ঠকচাচা তাকে ভুল পথে চালিত করে, যা তার চরিত্রকে আরও পথভ্রষ্ট করে।
- **সামাজিক প্রতিচ্ছবি:** তার জীবনযাত্রার মাধ্যমে উনিশ শতকের কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের একটি চিত্র ফুটে ওঠে।

- **নায়ক ও খলনায়ক:** যদিও সে নায়ক, কিন্তু তার খল চরিত্রও বিদ্যমান, যা উপন্যাসের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
- **চরিত্রের বিকাশ:** যদিও সে পথভ্রষ্ট, শেষে তার অনুশোচনা ও পরিবর্তন দেখানো হয়, যা উপন্যাসের নৈতিক দিককে তুলে ধরে।